দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 15 JAN 1995 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

উচ্চশিক্ষা ॥ ভর্তি সঙ্কট নিরসন করুন

আফরোজা পারভীন বানু

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি জনবহুল দেশ। জনসংখ্যার এই চাপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও প্রতিফলিত হচ্ছে। প্রতিবছর দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির জন্য ভিড় করছে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা যেমন মাত্র ৮টি, তেমনি এতে আসন সংখ্যা ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের তুলনায় বেশি নয়। অর্থাৎ দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি সঙ্কট অসহনীয়। প্রতিবছর বাড়ছে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা, তুলনামূলকভাবে বাড়ছে না এর আসন। সরকারের যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা আছে এই সঙ্কট সমাধানের, তাও মনে হয় না। অথচ শিক্ষা ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় হয় বলে সরকার প্রতি মুহূর্তে ঢাকঢোল পিটিয়ে জানান দিয়ে আসছে। আসলে যে মেঘ যত গর্জে তত বর্ষে না, তেমনি সরকারের শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয়ের হিসাবটাও যেন ফাঁকাবুলি মাত্র। অর্থ হয়ত ব্যয় হয় কিন্তু তার কোন সুফল নেই। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ভর্তির যে সঙ্কট চলছে গত প্রায় ৫/৬ বছর ধরে তার সমাধানে নেয়া হয়নি দীর্ঘমেয়াদী কোন পরিকল্পনা।

উচ্চশিক্ষার দু'টি স্তর আছে– সাধারণ শিক্ষা ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা। দেশের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সাধারণ শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে আসছে। বিজ্ঞানভিত্তিক কারিগরি শিক্ষা অর্জন করা যায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজগুলোতে। কিন্তু দেশে স্বাধীনতার পর সরকারী উদ্যোগে একটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়, একটি কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি মিশ্র ধাঁচের বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আর কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি। মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়েছে কয়েকটি। বেসরকারী উদ্যোগে মেডিক্যাল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিছু। কিন্তু এই সময়ে ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে ৫ গুণেরও বেশি। শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ার কারণেই বেড়েছে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা। ফলে ভর্তির ক্ষেত্রে সঙ্কট আজ তীব্র। বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যালে ভর্তি হতে পারা সৌভাগ্যের ব্যাপার। দিন দিন বাড়ছে প্রতিযোগিতা। এই পটভূমিতে কোন সন্দেহ নেই, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অধীনে দেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। অর্থাৎ নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, পেশাজীবীদের তৈরি করার জন্য বিশেষ বিশেষ বিষয়ের কলেজ সৃষ্টি করা ছিল খুবই জরুরী কাজ। এ জন্য স্বাধীনতার পর প্রতিবছর প্রায় গড়ে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় দেশে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন ছিল। না, এ কোন অবিশ্বাস্য ব্যাপার নয়। পাকিস্তানের কথাই ধরা যাক, আমাদের চেয়ে কম জনসংখ্যা সত্ত্বেও তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা এখন ৩০। প্রতিবেশী ভারতেও আমাদের তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা, অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক বেশি। ফলে প্রতিবছর হাজার হাজার ছাত্র ভারতে পড়তে চলে যায়। ব্যয় হয় দেশের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা। অথচ বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের কিভাবে শিক্ষার সুযোগ করে দেয়া যায়, সে সম্পর্কে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বা সরকারের কোন পরিকল্পনা নেই। দেশের ৩৬টি কলেজে মাষ্টার্স খোলার আকস্মিক ঘোষণাদান থেকেই বোঝা যায় এ ব্যাপারে কোন পূর্ব পরিকল্পনা তাদের ছিল না। গত দু'তিন বছর ধরে দেশের, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বলে আসছিল, তারা আর মাষ্টার্সে ছাত্র ভর্তি করতে পারবে না, সম্ভব নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানিয়েও দিয়েছিল সে কথা। সরকারের তখন টনক নড়েনি। কিন্তু এ বছর শক্ত অবস্থান নেয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় পড়ে বিপাকে। শুরু হয় সঙ্কট মোচনের চেষ্টা। ডাকা হয় সরকারী বড় কলেজগুলোর অধ্যক্ষদের। তারপর দীর্ঘ দেনদরবার। সম্ভাব্যতা যাচাই এবং থোর বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোর করে ঘোষণা দেয়া হলো ৩৬টি কলেজে মাষ্টার্স চালুর। শিক্ষক আছে কি নেই, ক্লাসরুম আছে কি নেই, ল্যাবরেটরির সুযোগ কতটা–খতিয়ে দেখা হলো না। সামান্য সুযোগ আছে, সুতরাং চালু কর মাষ্টার্স– এই হলো কলেজগুলোতে মাষ্টার্স খোলার ইতিবৃত্ত।

অর্থাৎ যা বলছিলাম। উচ্চশিক্ষাকে কিভাবে সম্প্রসারিত করা যায় সময়ের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে, সে ব্যাপারে সরকারের যেন কোন মাথাব্যথা নেই। কোন পরিকল্পনা নেই। কিন্তু এ অবস্থা তো বেশি দিন চলতে পারে না। এখনও দেশের উচ্চশিক্ষার সঙ্গে জড়িত বিশেষজ্ঞরা যেমন বলেছেন, এই সঙ্কট নিরসনে এগিয়ে আসতে হবে। এ জন্য দরকার অবশ্যই স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। স্বল্পমেয়াদী-আশু সমস্যা সমাধানের। দীর্ঘমেয়াদী ধীরে ধীরে সঙ্কটের দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের।

প্রথমেই সঙ্কটমুক্তির সবচেয়ে কার্যকর পথ হচ্ছে দেশে এ জন্য নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। কোন্ ক্ষেত্রে চাহিদা বেশি, কোন্ ক্ষেত্রে সমস্যা তীব্র তা চিহ্নিত করে সমস্যা সমাধানে এখনও ৪/৫টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া উচিত। আগামী দশ বছরে এই বিশ্ববিদ্যালয় (সাধারণ-বিজ্ঞান-কারিগরি) প্রতিষ্ঠার সংখ্যা অন্তত ৩/৪ গুণ হওয়া দরকার। পাকিস্তানে যদি এই মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা হয় ৩০, তাহলে ২০০৫ সাল নাগাদ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৫/৪০টি হওয়া নিশ্চয়ই অযৌক্তিক কোন ঘটনা নয়। দ্বিতীয়ত, কলেজগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ সম্প্রসারিত (অবকাঠামোগত) করে এখানে উচ্চশিক্ষা দান করার কাজ শুরু করা যায়। মাষ্টার্স শুরু প্রাথমিক পদক্ষেপ হতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে চালু করা উচিত আরও অনার্স, সম্ভাব্য সব বিষয়ে। তৃতীয়ত, বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ডাবল শিফট চালু করা যায়। প্রকৃতপক্ষে দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিজ্ঞান গবেষণাগারের কিছু ক্লাস ছাড়া বিকালের দিকে তেমন কোন ক্লাসই হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় না হলেও সাধারণ বিষয়গুলোতে ডাবল শিফট চালু করার কোন সমস্যা তো নেই-ই। হ্যাঁ, এ জন্যও যা দরকার তা হলো প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সৃষ্টি করা। আর তা শুধু শিক্ষক নিয়োগ করেই সম্ভব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই এ রকম একটা পরিকল্পনা নিয়ে এগুতে পারে। কলাভবন তো দুপুরের পর প্রায় নিঝুম, অব্যবহৃত থাকে। বর্তমানে সেশন জট কমে আসছে, সুতরাং ডাবল শিফট চালুর কথা তো ভাবাই যায়। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তো বলেছেন, কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সংখ্যা বাড়িয়ে ডাবল শিফট চালু করা যায়। কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি ডাবল শিফট সম্ভব, তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও কেন ডাবল শিফট চালু করতে পারবে না? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি নিয়ে ভাবার জন্য আমাদের অনুরোধ রইল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসন সংখ্যা বাড়িয়ে হয়ত ধারণ ক্ষমতা খুব বেশি হলে ১০% বাড়ানো যাবে, কিন্তু কিছুতেই ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটবে না।

প্রকৃতপক্ষে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ভর্তি সঙ্কট কিন্তু সাময়িক নয়। ব্যাপারটা দীর্ঘমেয়াদী। ক্রমবর্ধমান থেকেই যাবে সব সময়। সুতরাং এই সঙ্কট সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে সরকারকে এগুতে হবে। আর এ জন্য নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, সরকারী কলেজগুলোতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ডাবল শিফট চালু, বেসরকারী উদ্যোগকে আরও উৎসাহিত করা দরকার। সরকার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসবে বলে আমরা মনে করি। তা না হলে এই সঙ্কট ইতোমধ্যে নাগালের বাইরে চলে গেছে, ভবিষ্যতে সঙ্কট সমাধানের কোন পথই খোলা থাকবে না আমাদের।